NEHRU BAL PUSTAKALAYA

নেহেরু বাল পুস্তকালয়

# যেদিন নদী কথা বলল



ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

1982 (*Saka* 1903)
Reprinted 1986 (*Saka* 1908)



**The Day the River Spoke (*Bengali*)**

National Book Trust, India
REVISED PRICE Rs.5.00

Published by Director, National Book Trust, India,
A-5 Green Park, New Delhi-110016 and printed by
Jupiter Offset Press, B-10/3, Jhilmil Industrial Area,
Delhi-110032

নেহেরু বাল পুস্তকালয়—45

# যেদিন নদী কথা বলল





কমলা নায়ার
অনুবাদ
অমিতাভ চক্রবর্তী
ছবি
শঙ্কর সেন

ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
নয়াদিল্লি



ছোট্ট মেয়ে জান্থ। ছুই বাঁশঝাড়ের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে শরীরটা গলিয়ে এনে পা রাখল রাস্তায়। সরু রাস্তা চলে গেছে ধানক্ষেতের বুক চিরে। যতদূর চোখ যায়—নরম সবুজ ধান গাছের সারি। পুব দিকে নীল ধূসর পাহাড়। পাহাড়ের চূড়ো যেন মাথা ঠেকিয়েছে সকাল বেলার আকাশের গায়ে। পশ্চিমের সীমানা জুড়ে পুঁ ঝিক ঝিক রেললাইন। আর ওর সামনে, দক্ষিণ বরাবর এক নদী। সবুজ জলের রাশি নিয়ে বয়ে চলেছে। আঁকা বাঁকা পথে নানা উপলখণ্ডের উপর দিয়ে বয়ে সেই নদী মিলেছে সাগরে।

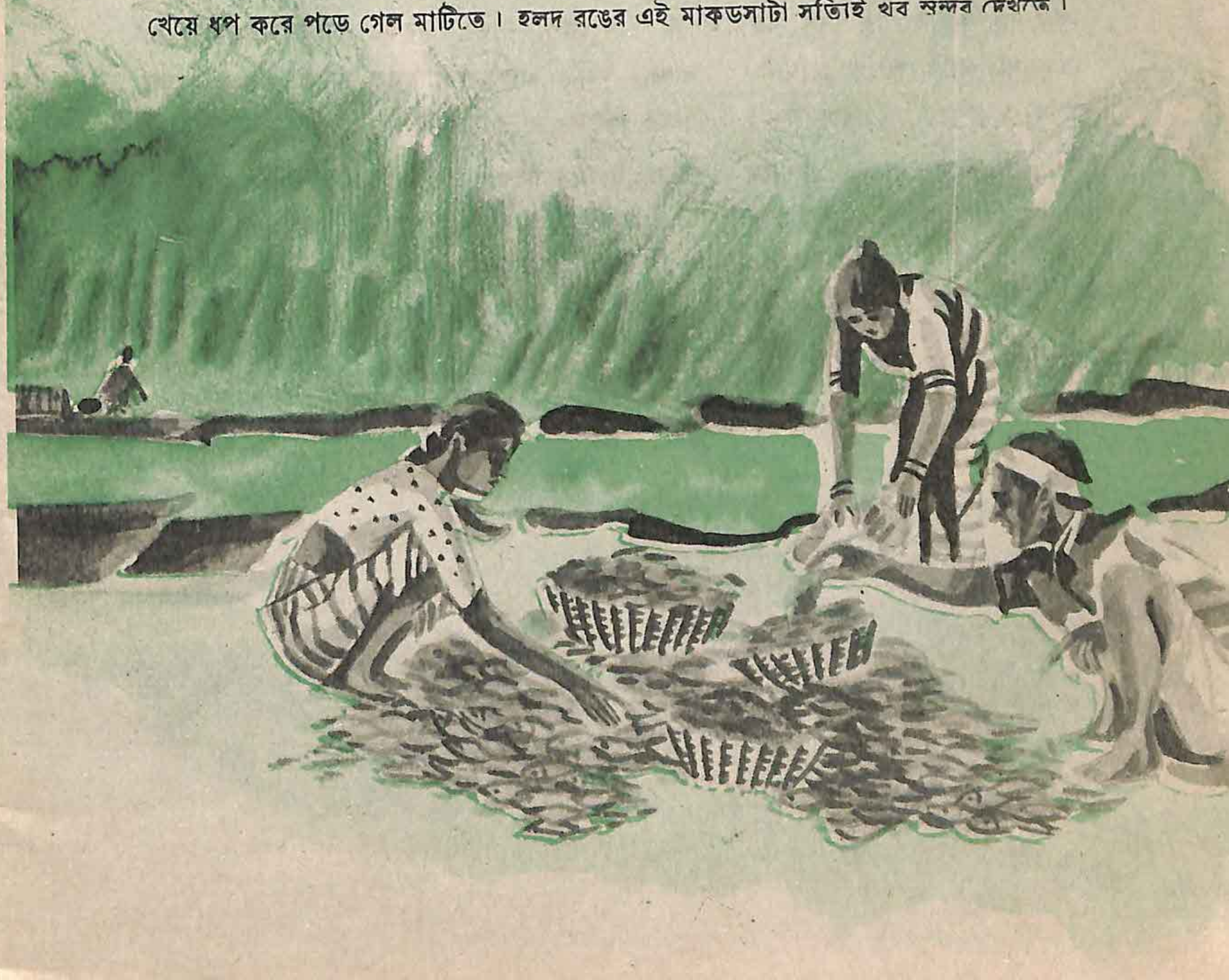
জান্থ অবশ্যই সাগর চোখে দেখেনি। কিন্তু ওদের গাঁয়ের চান্দু জেলের মুখে শুনেছে নদী বেয়ে সাগরে যাওয়ার মজাদার গল্প। শুনেছে চান্দু জেলে কেমন করে পাকা মাঝির মত নৌকো নিয়ে চলে যায় নদীর মোহনায়। দেখেছে সেখান থেকে চান্দু কত রকমের মাছ ধরে নিয়ে আসে। গলদা চিংড়ি থেকে শুরু করে রূপোলী রঙের সার্ডিন মাছ পর্যন্ত। তার সঙ্গে হাজার রকমের ঝিনুক। গাঁয়ের লোকেদের কাছে সে সব মাছ খুবই প্রিয়। হাঙর জাতীয় একরকমের ছোট ছোট মাছ আছে। লোকেরা সেগুলি কেটেকুটে নুন মাখিয়ে রান্নাঘরে তালপাতার তৈরী ঝোলার মধ্যে ঢেকে রেখে দেয়।

গাঁয়ের গা ঘেঁষে বয়ে যাওয়া এই নদীর ছুই তীরে সারি সারি নারকেল গাছ। সেইসব গাছের পাতা সূর্যের আলোয় দেখায় বিশাল পাখির পালকের মত। যখন রাতের আকাশে ওঠে গোল হলুদ চাঁদ পাহাড়ের চূড়ো ছাড়িয়ে, তখন পাতাগুলি যেন চাঁদের আলোয় স্নান করতে থাকে। জেগে ওঠে মর্মরধ্বনি। মাঝে মাঝে যখন বাতাস বইতে থাকে তখন বাঁশঝাড় থেকে ভেসে আসে একটানা টি-টিট্-টি শব্দ, যেন বাঁশগাছগুলি গান গাইছে বাঁশিতে সুর তুলে।



জানু ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সাগর থেকে ধেয়ে আসা নোনা হাওয়া এসে লাগছে নাকে। চলতে চলতে থমকে দাঁড়াচ্ছে। উবু হয়ে কুড়িয়ে নিচ্ছে পাথরের নুড়ি। এইসব নুড়ি সে জমিয়ে রাখে। মীনাদের বাড়ির পুকুরে নুড়ি ছুঁড়ে মারার খেলা খেলবে। পথের পাশে এদিক ওদিক নানারকম ফুলের গাছ। গাছের ডালে ডালে কত সব রঙীন ফুল। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। জানুর খুশি আর ধরে না! নীচু হয়ে হাত বাড়িয়ে একটা ফুল তুলে নিল। ফুলের পাপড়ি দু'টো দু'পাশ থেকে টেনে এনে একসাথে জুড়ে দিল। তখন ফুলটাকে দেখতে হল ঠিক যেন কানের দুল। ফুলটার গা থেকে ভেসে আসছে চমৎকার সুগন্ধ। জানু আরও কয়েকটা তুলে নিল। গুঁজে দিল লম্বা বিনুনীটার গায়ে গায়ে।

হঠাৎ চোখ পড়ল একটা হলদে রঙের ফুলের দিকে। ফুলের ঠিক মাঝখানটায় বসে আছে একটা মাকড়সা। গাঢ় হলুদ রঙ। প্রথমটা দেখে একটু ভয় পেয়েছিল। তারপর সাহস করে সে ফুলটাকে নাড়া দিল। মাকড়সাটা বোধহয় বসে বসে জাল বুনছিল। নাড়া খেয়ে ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে। হলদ রঙের এই মাকডসাটা সত্যিই খব সুন্দর দেখতে।



"এরকম মাকড়সা আমি আগে কখনও দেখিনি।" জানু ভাবল। ওর মনে হল, এটা এমন সুন্দর হলুদ রঙীন যে একটা ফুল বলেই মনে হয়। সে দেখেছে বাদামী রঙের মাকড়সা, দেখেছে বড় সাইজের কালো রঙের মাকড়সা—যা দেখলেই সে ভয় পায়। কিন্তু এরকমটি এমন সুন্দর রঙের মাকড়সা এর আগে সত্যিই সে দেখেনি।

এক সময় জানু এসে পেঁাছল নদীর ধারে। সেখানে আছে একটা পাথর। পাথরটাকে ওর খুব পছন্দ। ও বসল পাথরটার উপর। হাতের চেটোর উপর চিবুক রেখে কিছু একটা ভাবতে বসল। জানুর চোখ দু'টো বেশ বড় টানা টানা আর চোখের দৃষ্টি খুব উজ্জ্বল। ওর মা ওর চোখে পরিয়ে দেন গাঢ় করে কাজল। বেশ লাগে দেখতে। আর বেঁধে দেন লম্বা বিনুনী।

একটা গিরগিটি পাথরটার তলা থেকে বেরিয়ে এসে সুড়ুৎ করে পালিয়ে গেল বাঁশগাছের আড়ালে। দূরে কামারশালা থেকে ভেসে আসছে ঠকা-ঠক ঠকা-ঠক শব্দ। সামনে নদী নিঃশব্দে বয়ে চলেছে। জানু নিজেকে শুনিয়ে কিছু বলল। এইরকম একা একা নিজের সঙ্গে গল্প করতে ওর বেশ মজা লাগে। ও বলল, সত্যি, এরকম চমৎকার হলুদ রঙের মাকড়সা আমি আগে দেখিনি। আচ্ছা, হলুদ মাকড়সাটা হলুদ রঙের ফুলের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল কেন? এট্টনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে।

এট্টন ইস্কুলে যায়। সেখানে মাস্টারমশাই ওকে লিখাপড়া শেখান। ও ওদের বারান্দায় বসে খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করে। একই পড়া বারবার পড়ে। জানু লক্ষ্য করেছে, ওদের গাঁয়ের সব ছেলেই ইস্কুলে যায়। কিন্তু সব মেয়ে তো যায় না ইস্কুলে।







মীনা অবশ্য ইস্কুলে যায়। তার কারণ আলাদা। মীনার আর কোন ভাই বোন নেই। ওর বাবা গাঁয়ের প্রধান—গাঁওবুড়ো। ওর মা যখন রেলগাড়ি চেপে বড় শহরে যান তখন সোনালী জরি পাড় ব্লাউজ পরেন। হাতে রাখেন কালো কুচকুচে চমৎকার একটি ছাতা। মীনারও একটা ছোট্ট ছাতা আছে। কালো রঙের। হাতলে লাল ফিতের গুচ্ছ।







গাঁয়ের বাকি সবাই ব্যবহার করে তালপাতার তৈরী ছাতা—যা নাকি মাথায় টুপির মত
দেখতে লাগে। বেশ বড় আকারের। চারপাশে অনেকটাই থাকে ছাওয়া। বৃষ্টির সময়
ক্ষেতে কাজ করার পক্ষে এই ধরণের ছাতাই সবচাইতে ভাল। মাথায় বসিয়ে দিলেই হল
এক হাত দিয়ে ছাতার বাঁট ধরে রাখতে হয় না। ফলে, দু'টো হাতই কাজে লাগানো যায়
তবে কিনা, কালো রঙের ওই ছাতা দেখতে ভারি সুন্দর।

"মা, আমি কেন এট্টন ও মীনার মত ইস্কুলে যেতে পারি না?" জানু তার মাকে একদিন
প্রশ্ন করেছিল।

জানু তার ভাইকে এট্টন বলে ডাকে। এট্টন শব্দটার মানে হল বড় ভাই। ওর আসল
নাম গোপী।

মা বলেছিলেন, "তুমি এখন খুব ছোট্ট, সোনা। বড় হয়ে যাবে।"

কিন্তু পরে যখন জানুর বয়স হল পাঁচ বছর, ছোট্ট রামু জন্মালো, তখন ওর মা বললেন,
"আসছে বছর যাবে লক্ষ্মীটি। আমি মাঠে কাজ করতে গেলে ছোট্ট ভাইটিকে কে দেখবে
বলো।"

তখন রামুর বয়স ছিল দু'বছর। যখন তার তিন বছর হল, তখন মা বললেন, "মেলাই
কেঁদোনা বাপু। এট্টন ইস্কুলে যায়। কারণ, সে ছেলে। সব ছেলেকেই লেখাপড়া শিখতে হয়।
তুমি আমার ছোট্ট মেয়ে। বাড়িতে থাকবে। ঘরের কাজকর্মে, ভাত রাঁধতে, রান্নার কাঠ
জোগাড় করতে আমাকে সাহায্য করবে। ছোট্ট ভাইটিকে দেখবে যাতে কোন বিপদ আপদ
না ঘটে।"

"কিন্তু মীনাও তো মেয়ে, সে যে ইস্কুলে যায়।"

"মীনার বাবার অনেক টাকা", বাবা বললেন। তিনি তখনই মাঠের কাজ সেরে ঘরে
ফিরেছেন। বললেন, "মেয়েদের ইস্কুল পাঠানো? কোন কাজে বাপু? সেখানে রান্না করতে



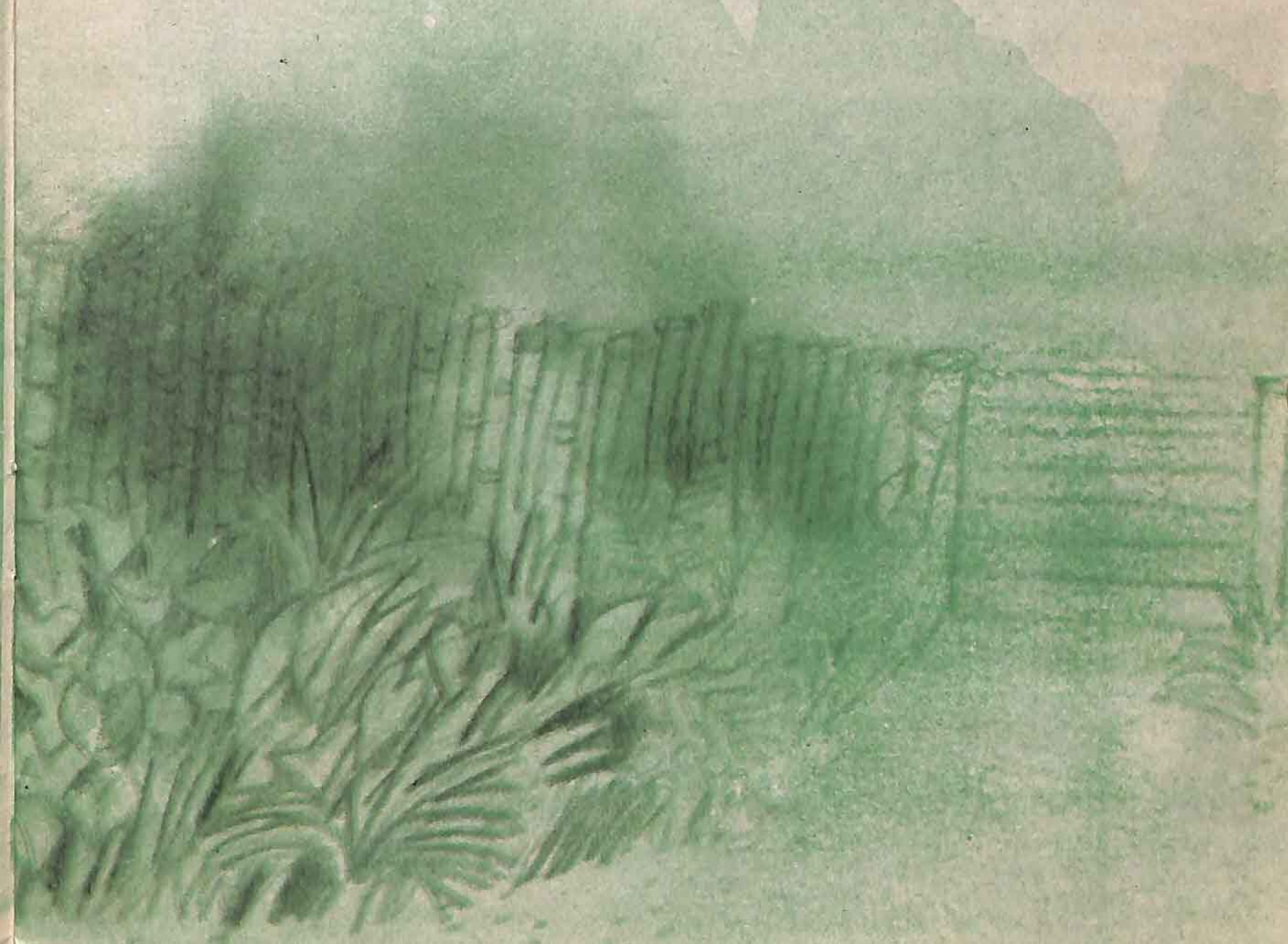
শেখায়? মেয়েদের তো ওটা শিখতেই হয়। বলি, ইস্কুলে ঘর ঝাঁট দিতে শেখায়? ভাতের ফেন গালতে শেখায়, না ধান কাটতে শেখায়?"

ওদিকে জ্যাঠামশাই বারান্দার এক কোণে মাদুর পেতে ঘাপটি মেরে শুয়েছিলেন বললেন, "ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা কি? দিনকে দিন মেয়েটা কুড়ে হয়ে যাচ্ছে। ওকে চাবকানো উচিত……" কথা শেষ করার আগেই গলা বন্ধ হয়ে গেল। পানের কুচি গলায় আটকে কাশি উঠল। জানুর মা ছুটে গিয়ে তাঁর পিঠে হাত বুলোতে লাগলেন যাতে আরাম পান। আর এদিকে জানু এক কোণে দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। কেউ তার কথা শুনতে চাইছে না।

"ও বাবা, আমি তো তোমায় কথা দিচ্ছি, ইস্কুল থেকে ফিরে এসে ঘরকন্নার সব কাজই করব।"

"কিন্তু আমি জানতে চাই, তোমার ছোট্ট ভাই ওই রামুকে কে দেখবে?"

জানু ওর মার দিকে তাকাল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওঁকে ঠিক সেইরকম দেখাচ্ছে, যেমন দেখাচ্ছিল রামু জন্মাবার ঠিক আগে।



তুমি বাছা, দৌড়ে গিয়ে চান্দুর কাছ থেকে কিছু সার্ডিন মাছ কিনে নিয়ে এসো তো! মা বললেন। এইভাবে তিনি কথা ঘোরালেন। জানু মার কাছ থেকে পয়সা নিল। মাছ রাখার চুপড়ি নিল সঙ্গে। তারপর বেরিয়ে গেল।

চান্দু যখন শুনলো, জানু এট্টনের মতো ইস্কুলে যেতে চায়, তখন সে তো হেসেই খুন।

"তোমার ইস্কুলে গিয়ে কী হবে বাপু? চান্দু জিজ্ঞেস করল। লেখাপড়ার নিকুচি করেছে! আমি তো বলি, সময় নষ্ট করা। তুমি যদি বলো, আমাকে মাছ ধরার জাল বুনতে শিখিয়ে দাও কিম্বা মাছ ধরা শেখাও, তাহলে বাপু সে কথারও একটা মানে বুঝি। ইস্কুল দিয়ে কী হবে? ফুঃ।" চান্দু কথা শেষ করে এক দলা থুতু ফেলল পাশেই জলের উপর।

চান্দু কয়েকটা সার্ডিন মাছ এক টুকরো কাগজে মুড়ে দিল। বলল, এই নাও। এক দৌড়ে বাড়ি চলে যাও। ঘরের কাজকর্ম মন দিয়ে শেখো যাতে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে লক্ষ্মী বউ হতে পারো। আর, হ্যাঁ, মাকে বলো সার্ডিন মাছ আর বড় একটা পাওয়া যাচ্ছে না। এর পরে ওই হাঙর-মাছ নিতে হবে।





এট্টনের এখন বার বছর বয়স। সে বেশ চটপট মাথায় লম্বা হয়ে উঠছে। পাঁচ বছর বছর বয়স হ'ল রামুর। সেও এখন ইস্কুলে যাচ্ছে। জানুর হল দশ। সে এখন তার আর একটি ছোট্ট ভাই আপ্পুর দেখাশোনা করে। আপ্পু এখন বাড়ির মধ্যে সব চাইতে ছোট্টটি। মার চোখ এড়িয়ে, বাঁশঝাড় পেরিয়ে ধানক্ষেতের পথ বেয়ে জানু এখনও মাঝে মাঝে সেই নদীর কাছে আসে। নদীকে তার বড় ভাল লাগে। শান্ত। ধীর স্থির। নীরবে বয়ে চলেছে। কিন্তু, হ্যাঁ, আজকের দিনটা ঠিক অন্য দিনের মত নয়।

জানু বসেছিল। চোখের জলের একটি বড় ফোটা গড়িয়ে এসে পড়ল নাকে। আবার একটি। একটা মাছরাঙা পাখি সোঁ করে নেমে এল নীচের দিকে। সূর্যের আলোয় তার পাখনা হু'টো যেন ঘন নীল রঙের তীরের মত দেখাচ্ছে। সবুজ রঙের একটি গিরগিটি লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গেল জলের কিনারে। সেখানে শুয়ে থেকে সে রোদ পোহাবে।

"ও আমার মিষ্টি সোনা!" কে যেন ঘুম জড়ানো গলায় ফিসফিসিয়ে বলে উঠল, "কী হয়েছে তোমার?"



জানু চমকে ওঠে। ও জানে, ও এখানে একা। এ নিশ্চয়ই ওই গিরগিটিটার গলা নয়। তা হতেই পারে না। মাছরাঙা পাখিটা একটা মাছ ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গিয়ে বসেছে বাঁশগাছে। খুব মন দিয়ে মাছ খাচ্ছে। সেও বলতে পারে না। চড়ুই পাখিও নয়। ওদের গলার স্বর খুব তীক্ষ্ণ। কিন্তু এ যে ঘুম জড়ানো ফিসফিসিয়ে বলা। জানু বেশ ভয় পেল। ছুটে চলে যেতে চাইল।

"ছিঃ তুমি জানো, কাঁদতে নেই।" সেই কণ্ঠস্বর, "তুমি তো প্রতিদিন, প্রায় প্রত্যেক দিনই আমার কাছে আস, আমাকে দেখতে আস। তাহলে তোমার ভয় পাওয়া সাজে না।"

জানু ভীষণ ভাবনায় পড়ে যায়। এমনই ঘুম জড়ানো ফিসফিস স্বর, যেন ঠিক নদীর মতোই। এমন স্বর তো নদীরই হতে পারে, নয় কি!

"তোমার সব কথা আমাকে বলো।" নদী বলল, "তুমি তো জানো আমার তাড়া আছে। আমাকে পৌঁছতে হবে সাগরে।"

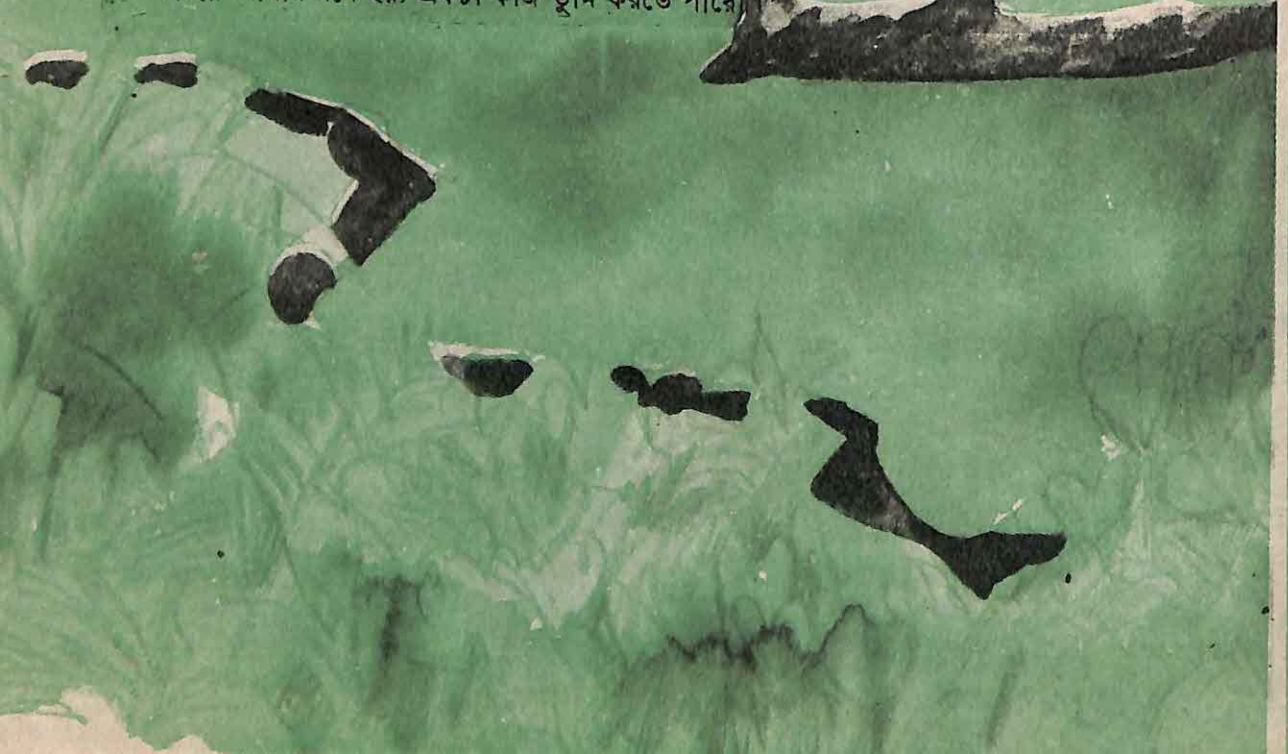


"ওঁরা আমাকে ইস্কুলে যেতে দেন না," জানু বলল। "ওঁরা মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে চান না। ওঁরা কেবল"—জানুর গলা বুজে আসে, "কেবল ছেলেদেরই পড়াতে চান। এখন আমি অনেক বড় হয়ে গিয়েছি। ওঁরা আর আমাকে ইস্কুলে পাঠাবেন না। কিন্তু আমি ইস্কুলে যেতে চাই। এট্টন ও মীনার মতো আমিও লেখাপড়া করতে চাই। আমি জানতে চাই কেন হলুদ ফুলে থাকে হলুদ মাকড়সা? কেন বাঁশ গাছ অমন শনশন শব্দ করে, কেন চাঁদ কেবলই পাহাড়ের ধার ঘেঁষে আকাশে ওঠে, কেন পুকুরের কুচো কুচো মাছ একদিন ব্যাঙ হয়ে যায়, কেনই বা·········

"থামো, থামো।" নদী বলল। "তুমি তো আমার দম বন্ধ করে দিচ্ছ। বাপরে! এতগুলো 'কেন'! আমি কিন্তু তোমায় বলতে পারি চাঁদ কোথায় যায়।" নদী দুষ্টুমির সুরে বলতে থাকে, "সে যায় সাগরের নীচে। আমি তাকে দেখেছি। রোজই সে এক পথ দিয়েই যায়। পাহাড়ের মাথার ওপর থেকে সমুদ্রের নীচে—একই পথ। অনেকটা আমারই মত।"

"এমন কি ছোট্ট যে রামু, সেও ইস্কুলে যায়।" জানু ধরা গলায় বলতে থাকে।

"ও হো! তোমার ইস্কুলটার জন্য ভারি দুঃখ হচ্ছে। আহা, ওটা সাগরের কাছে নয়।" নদী বলল, "যদি তা হতো, তাহলে আমিই তোমাকে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু সত্যিই তা হবার নয়। [illegible] তা কখনও করা উচিত নয়। আচ্ছা, আমার মনে হয়, একটা কাজ তুমি করতে পারো।"





"করতে পারি? সত্যি পারি?" জানু আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ, পারো। ইচ্ছে করলেই পারো। সবটাই তোমার উপর নির্ভর করছে।" নদী বলল। আরও বলল, "আমার তো মনে হয় ছোট ছেলেরা যা করতে পারে, ছোট মেয়েরাও তা পারে। এই দ্যাখো না, কী ছেলে, কী মেয়ে সবাই তো সমান সাঁতার কাটতে পারে। তা তুমি বাছা একদিন সটান ইস্কুলে চলে যাও না। সোজা গিয়ে ক্লাসে বসে পড়া শুনতে থাকবে। আমার কী মনে হয় জানো? মাস্টারমশাই নিশ্চয়ই তোমাকে ক্লাসে বসতে দেবেন।



"আমি তা পারি না।" জানু মাথা নাড়ল। "ওরা আমাকে ভাগিয়ে দেবে। আমাকে ভয় দেখাবে।"

নদী হেসে উঠল। বলল: "ভয় দেখাবে? তোমাকে? হা হা হা হা। কই, তুমি তো বাপু ভয় পাওনা সবুজ গিরগিটি দেখে, বাঁশতলায় সাপ দেখে" (জানু শিউড়ে ওঠে) "কিম্বা ব্রিজের উপর দিয়ে ট্রেন চলার ঝমঝম শব্দ শুনে। জানো, ট্রেনে ভারি শব্দ হয়, আমার পছন্দ জাহাজ।"

সাপের কথা শুনে সে শিউড়ে উঠেছিল, জানু এখন তা ভুলে গেল।

জাহাজ কী? জানু শুধোয়।

"বিরাট নৌকো," নদী বুঝিয়ে বলে, "এত বিরাট যে তার মধ্যে কয়েক শ' লোক থাকতে পারে। সমুদ্রের যে কোন জায়গায় যেতে পারে। আর আছে আলো। সারা রাত ধরে সেই আলো জ্বলতে থাকে। দূর থেকে তা দেখা যায়।

জানুর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। "ওরা কি এখানেও আসে?" সে জানতে চাইল।

"না, বাপু। এত বিরাট, শুনলে তো।" নদী বলল, "চান্দুর যে নৌকোখানা আছে, আমার এখানে তাই যথেষ্ট। চান্দু তোমাকে একদিন জাহাজ দেখাতে নিয়ে যেতে পারে।"

"ওঁরা আমাকে যেতে দেবেন না।" জানু বিষণ্ণ গলায় বলে, "দূর ছাই, কেন যে মেয়ে হলুম!"

"তুমি বাপু, প্রথমে ইস্কুলে যাওয়ার চেষ্টা কর।" নদী বলল, "মনে রেখো, সব কিছুই কিন্তু তোমার উপর নির্ভর করছে।

এবার নদীর সেই ঘুম জড়ানো স্বর ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। তারপর একসময় জানু আর শুনতেই পেল না। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল। জানু এতক্ষণ নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছিল। পাথরটা থেকে নেমে পড়ল। চারদিকে চোখ রেখে সন্তর্পণে বাঁশঝাড় পেরিয়ে



এসে রাস্তায় পড়ল। ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে রাস্তা। চলতে চলতে জানু ভাবল, সে স্পষ্ট নদীর কথা শুনতে পেয়েছে। খুব ধীরে ঘুম জড়ানো গলায় নদী কথা বলেছে।

শেষ পর্যন্ত সে ইস্কুলে যাওয়া ঠিক করল। কাজটা অবশ্য খুব সহজে হয়নি। বাবার মাঠে না যাওয়া পর্যন্ত এবং মার রান্নাবান্না শুরু না করা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হল। তারপর সে চুল আঁচড়ে নিল। মীনার মা ওকে যে লাল রিবনটা দিয়েছিলেন, তা মাথায় বাঁধল। জ্যাঠামশাই সকালবেলাতেই আমের চাটনি আর নুন দিয়ে পান্তাভাত খেয়ে এখন বারান্দায় ঘুমোচ্ছেন। ছোট্ট আপ্পু একমনে বুড়ো আঙুল চুষছে। এট্টন আর রামু ইস্কুল চলে গিয়েছে।

রামু এখন এট্টনের পুরনো শেলেটখানা ব্যবহার করছে। যখন কেউ শেলেটখানায় লিখত না, তখন মাঝে মাঝে জানু শেলেটটা নিয়ে তার উপর ছবি আঁকতো। সে আঁকতো চান্দুর নৌকো, বাঁশঝাড় আর ইস্কুল। শেলেটের উপর তুমি যত খুশি আঁকতে পার। একবার আঁকলে, মুছে ফেললে। আবার আঁকলে। এইরকম আর কী।

জানু মাদুরের উপর আপ্পুকে বসিয়ে দিয়ে বাড়ির সদরের দিকে চুপি চুপি এগিয়ে গেল। আর ঠিক সেই সময় আপ্পু ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে জানু ভাইকে কোলে তুলে নিল। আপ্পু মহা খুশি। খুশিতে সে দিদির গালে ঘুষি মারতে শুরু করে দিল।

পথ চলতে চলতে জানু ভাইকে শাসন করতে লাগল, "দুষ্টু কোথাকার! এখন আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ওখানে গিয়ে যদি কান্নাকাটি শুরু করো, তাহলে আমি……আমি তোমাকে গাছের তলায় রেখে আসব। আর তখন চড়ই পাখিরা এসে তোমাকে নিয়ে চলে যাবে।"





প্রায় এক দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে জানু এসে হাজির হল ইস্কুলে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল, মাস্টার মশাই কী পড়াচ্ছেন। পড়ানো হচ্ছিল অশোক নামে এক রাজকুমারের গল্প। পরে তিনি হয়েছিলেন একজন মহান সম্রাট। ছোট্ট আপ্পু ততক্ষণে দিদির কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। জানু পা টিপে টিপে এগিয়ে যেতে লাগল। চুপিসারে একসময় গিয়ে বসে পড়ল সবার শেষে। আপ্পু কোন গোলমাল করেনি। সেও মন দিয়ে পড়া শুনতে লাগল।

মাস্টার মশাই তখন পড়া ধরছিলেন। প্রশ্ন করছিলেন। সকলেই উত্তর দিতে ব্যস্ত। কেউ খুলছে বইয়ের পাতা। কেউ বা হাত তুলে জানাচ্ছে, সে পারবে উত্তর দিতে। এইভাবে



প্রশ্নোত্তরের পালা শেষ হলে মাস্টারমশাই বললেন, এখন আমি তোমাদের একটা খুশির খবর দিচ্ছি। সামনের সপ্তাহে আমরা তোমাদের ট্রেনে করে কোঝিকোড়ে নিয়ে যাব। সেখানে তোমরা দেখতে পাবে বিরাট বাজার, টালি তৈরির মস্ত কারখানা। তোমাদের দেখাবো সমুদ্র আর বাতিঘর।

বেড়ানোর খবর শুনে ছেলেরা হৈ হৈ রৈ রৈ করে উঠল।

"স্যার! বাতিঘর কি?" কুট্টি জিজ্ঞেস করল। ওর বাবা তাঁতী।

"হুঁ। বাতিঘর একটা বাড়ি, চেহারায় একটা পেন্সিলের মত। কিন্তু পেনসিলের চেয়ে আকারে অনেক অনেক বড়। মাথায় জ্বলে আলো। অনেক দূর থেকে দেখা যায় সেই আলো। তাই দেখে সমুদ্রের জাহাজ নিরাপদে পথ চলতে পারে। বুঝেছো?"

"স্যার, জাহাজ কি নৌকোর মত?" নানু জানতে চাইল। ওরা থাকে বনের এক ধারে। দু' মাইল দূর থেকে রোজ ইস্কুলে আসে। আবার ফিরে যায়।

"বেশ। আচ্ছা, নানুর প্রশ্নের জবাব কে দিতে পার?" মাস্টার মশাই শুধোলেন। এদিকে জানু ততক্ষণে আপ্পুর কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছে।



ভয় বা লজ্জা—ভুলে গেছে তাও। সে দিব্যি পরিষ্কার গলায় বলল, জাহাজ নোকোর চেয়ে অনেক অনেক বড়। এত বড় যে কয়েক শ' লোক একসঙ্গে এর মধ্যে থাকতে পারে। তাছাড়া……" বলতে বলতে থেমে গেল।

সবার চোখ তখন জান্থ আর আপ্পুর দিকে। প্রশ্নের উত্তর দিতে ওঠার সময় ঝাঁকানি খেয়ে আপ্পুর ঘুম ভেঙে যায়। চিল চিৎকার শুরু করে দেয়। তাই দেখে জান্থ তো থ। দিশেহারা।

"কোত্থেকে এসেছো মেয়ে?" মাস্টারমশাই প্রশ্ন করলেন, "তোমার নাম কি? আমার ক্লাসে নতুন এসেছো। তোমাকে বুঝি বলা হয়নি যে, ছোট ছোট ভাই বোনদের ক্লাসে নিয়ে



আসবে না ? কার এই বাচ্চাটা ? কে সঙ্গে করে এনেছে ? অ্যাঁ ! উত্তর দাও ।"

মাস্টার মশাইয়ের চশমা নাকের ডগা থেকে পড়ো-পড়ো । ক্লাস শুদ্ধ ছাত্ররা মাথা নাড়ছে । এর মধ্যে কাঁপা কাঁপা গলায় জানু বলতে লাগল, "জ-জানু স্যার । ও আমার ছোট্ট ভাই । আমি ওকে কাঁদাতে চাইনি স্যার ! আমি ওকে···মানে······"

"ও স্যার, পাশের ক্লাসে গোপী আছে না ? ওর বোন ।" একজন বলল ।

"ওর নাম জানু ।" আর একজন বলল ।

"ও গোপালন খুড়োর মেয়ে ।" অন্য আর একজন বলল ।

মাস্টার মশাই বললেন, "এদিকে এসো জানু । ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভাইকে কোলে নিয়ে নাও । ওকে নিয়েই এসো । আমার কাছে এসো । আর, ওহে ছেলেরা, তোমরা বাইরে যেতে পার ।"

জানু বেশ ভয় পেয়েছে । ভয়ে কাঁপছে । আপ্পুর চোখে মুখেও ভয় ভয় ভাব । সে হাঁ করে দেখছে অচেনা মাস্টার মশাইয়ের মুখ । ক্লাসের ছেলেরা সব বাইরে চলে গেছে রোদে খেলা করতে । ক্লাস ঘরে জানু একা । মাস্টারমশাইয়ের মুখোমুখি । জানুর ভাল লাগল না । মনে মনে ভাবল, আর সে ইস্কুলে আসবে না । ছেলেমেয়েরা না থাকলে ইস্কুলঘর কী ভয়ানক ! বাপস !



"আচ্ছা, তুমি গোপীর ছোট বোন ? গোপী তো খুব ভাল ছেলে।" মাস্টার মশাই বললেন। চশমার কাচের ওপর দিয়ে মাস্টার মশাইয়ের দৃষ্টি জানুর মুখের ওপর। বললেন, "মনে হচ্ছে, তুমি যে এখানে এসেছো, গোপী তা জানে না।"

"হুঁ। আমার ধারণা, তোমার মা ভাবছেন, তুমি হারিয়ে গিয়েছ। তোমার ছোট ভাইটিও। তা, এখন বলো তো, তুমি আগে কখনও ইস্কুলে আসো নি কেন ?" মাস্টার মশাই একটা পেনসিল এগিয়ে দিলেন ছোট্ট আপ্পুর দিকে। সে খুব লাজুক লাজুক ভাব নিয়ে কিছুক্ষণ দেখল পেনসিলটাকে। তারপর একসময় খপ করে তা হাতের মুঠোয় ধরে ফেলে।

এই ফাঁকে মাস্টার মশাই জানুর কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব' জেনে নেন। কেন সে ইস্কুলে আসে না, তাও বুঝলেন। তখন [illegible]ড়িয়ে



গেছে। জানু ভাইকে নিয়ে বাড়ি ফিরল। ওদের দেখতে না পেয়ে মা তো ভেবে ভেবে সারা। তাই জানুকে তিনি খুব একচোট বকলেন। বাবাও রেগে আগুন। বললেন, এরকম করলে একদিন আস্ত একখানা বেত তোমার পিঠে ভাঙব। বাবা অবশ্য কাজ থেকে ফিরে এসে প্রায় দিনই এইরকম কথাবার্তা বলেন।

কিন্তু জানুর গোপন কথা গোপনেই রইল। সেই কথাটা যেন তার আদরের তামার পয়সাটির মতো। যা সে রোজ তেঁতুল গোলা জলে ঘষে মেজে পরিষ্কার করে রাখে। শোয়ার সময় যত্ন করে রেখে দেয় বালিশের নীচে। অবশ্য, গোপী যখন ইস্কুল থেকে ফিরে আসবে, তখন সবাই জেনে যাবে। জানবে, জানু আজ কোথায় গিয়েছিল। কিন্তু কেউই তো জানতে পারবে না, মাস্টার মশাই তাকে কী বলেছেন। উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেই প্রতিশ্রুতি ওর তামার পয়সাটার মতই মূল্যবান ওর কাছে। মাস্টার মশাইয়ের কথাগুলি তামার পয়সার মতই উজ্জ্বল রঙে ওর মন রাঙিয়ে দিয়েছে।



"তুমি যদি, জানু, সত্যি··· সত্যিই ইস্কুলে আসতে চাও", মাস্টারমশাই বলেছেন, "তাহলে তোমার বাবার সঙ্গে আমরা এই নিয়ে কথাবার্তা বলব। কোন চিন্তা নেই। ব্যবস্থা একটা হবেই।"

মীনা তো জানুর ইস্কুল যাওয়ার গল্প শুনে হেসেই খুন। মীনা অবশ্য সব ব্যাপারেই সব কথাতেই কেবল হাসে। আর হাসলেই ওর গালে টোল পড়ে। তখন ভারি সুন্দর দেখায় ওকে। মীনা জানালো, জানুর ইস্কুলে যাওয়ার গল্প গ্রামের লোকের মুখে মুখে। মীনার বাবা বললেন, চমৎকার। পড়াশুনোয় কী আগ্রহ মেয়েটার। দুঃখের বিষয়, অনেক ছেলেরও এমন আগ্রহ নেই। মীনার মা বললেন, দাঁড়া না। জানু বড় হোক। তখন ও এখানকার সকলকে চমকে দেবে। লক্ষ্মী মেয়ে।

মীনা বলল, এখন বাপু চল, আমরা একটু সাঁতার কাটি। আয়, পুকুরে সাঁতারের পাল্লা দিই। মীনাই জানুকে টেনে পুকুরে নামাল। ওরা অনেকক্ষণ ধরে সাঁতার কাটল। কতবার দু'জনে মিলে পুকুরটার এপার ওপার করল।

ইস্কুলে বেশ মজা, মীনা বলল। ওর মাথায় একরাশ ঝাকড়া ঝাকড়া চুল। চুল ঝাঁকিয়ে বলল, তোরও বেশ ভাল লাগবে। আমার মনে হয়, তোর বাবা তোকে ইস্কুলে যেতে দেবেন। আমার বাবা তো আমাকে বলেছেন, "তুমি যদি সত্যি পড়াশোনা করতো চাও তো করো। যতদূর খুশি পড়ো না। দরকার হলে তোমাকে হাইস্কুলেও ভর্তি করে দেবো।"

"আর হাইস্কুলের পরে?" জানু জিজ্ঞেস করল। যদিও হাইস্কুলটাই যে কি, তা ও জানে না। মীনা অবশ্য এর উত্তর দিতে পারল না। ওর জানা নেই।

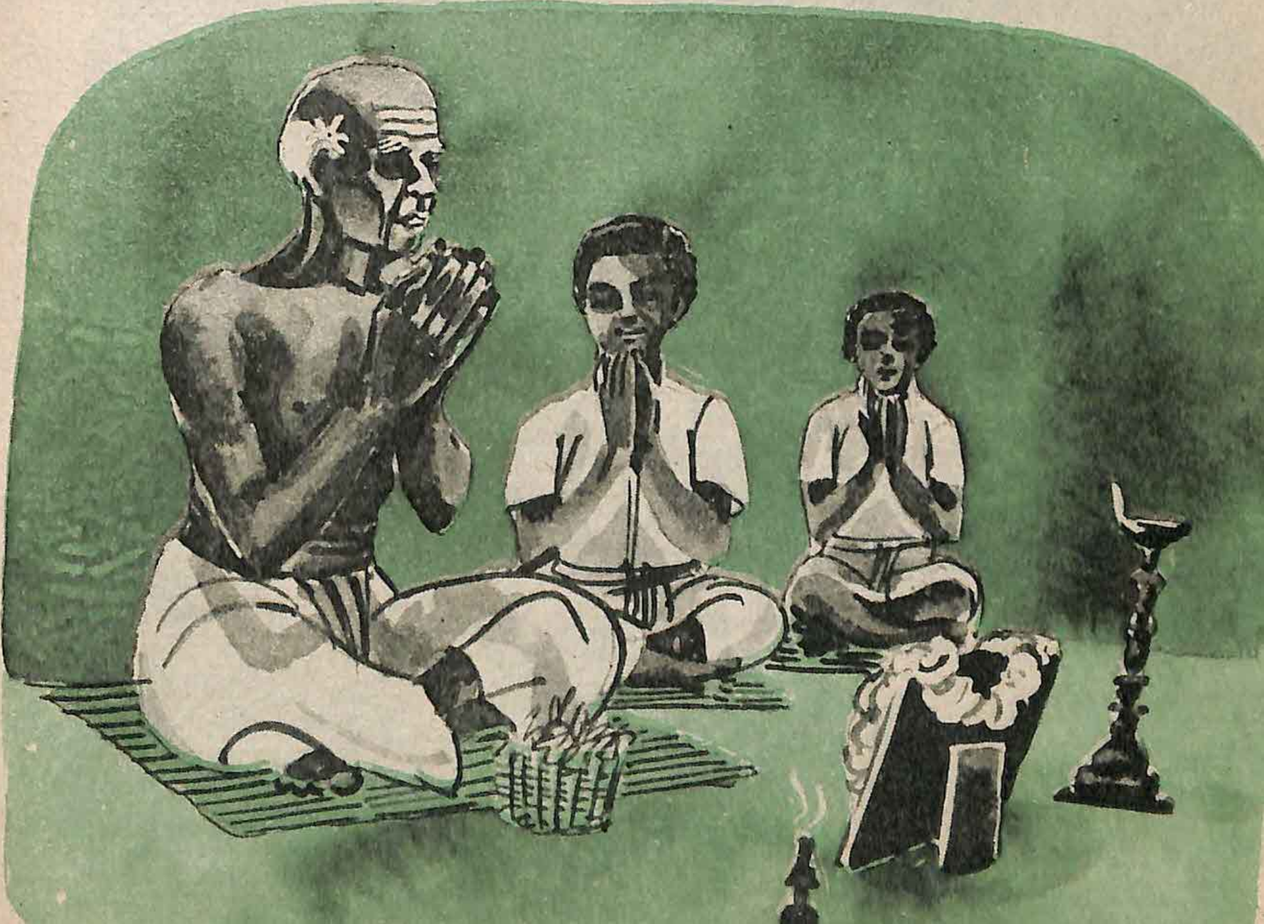
পরদিন সন্ধ্যেবেলা জানু আলো জ্বালছিল। ঠিক তখনই দেখতে পেল, মাস্টারমশাই আসছেন। ওদের বাড়ির দিকেই। জানু একটা প্রদীপ ধরাল। সেটাকে নিয়ে এল বাড়ির সামনে দিককার বারান্দায়। বারান্দার সিঁড়ির উপর এক কোণে ছোট্ট প্রদীপটি রেখে দিল। প্রদীপের মিটি মিটি আলোয় যেন বাড়িটির মঙ্গল আরতি হচ্ছে। ওদিকে জ্যাঠামশাই কানে গুঁজেছেন তুলসিপাতা। তারপর আসনপিঁড়ি হয়ে ঠাকুরের সামনে বসে প্রার্থনা করছেন। মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে এট্টন আর রামু। রামুর অবশ্য মন্ত্রের শক্ত-শক্ত শব্দগুলো উচ্চারণ করতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। জানুরও ইচ্ছে হল, সে প্রার্থনা করে। সে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মন্ত্র বলতে তারও মন চাইছিল। কিন্তু সে তা করল না। সে মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাল। খুবই সামান্য সে প্রার্থনা, সে চাইছিল, ভগবান যেন তার সেই সামান্য প্রার্থনাটুকু পূরণ করেন।



এখন দূর থেকে জানু দেখতে পেল, ওর বাবা অভ্যাস মতো চিবুক চুলকোচ্ছেন। এমনটা তিনি প্রায়ই করে থাকেন। তাঁকে বেশ চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছে মাস্টারমশাই মাথা নেড়ে নেড়ে কিছু একটা বলছেন। কী বলছেন, জানু তা বুঝতে পারছে না। তারপর দেখল, মাস্টার মশাই ওর বাবাকে একটা পান দিলেন। বাবা পান খেলেন। একটা বিড়ি দিলেন। দু'জনেই বিড়ি ধরিয়ে বন্ধুর মত কথা বলতে বলতে বাঁশতলার রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলেন।

"জানু রে, তুই ইস্কুলে চলে গেলে ঘরের কাজে আর তোর কোন সাহায্যই পাব না।" মা বললেন। "আজকাল সবাই বলছে, মেয়েরাও নাকি ছেলেদের মতই, পড়াশুনো শিখবে। তা বাপু, আমার যখন তোর মত বয়স ছিল, তখন আমারও খুব শখ ছিল ইস্কুলে পড়বার। তাই শুনে তোর দিদিমা স্পষ্ট বলে দিলেন, খবরদার না। তা যাক্। মাস্টার মশাই নিজে থেকেই এসেছেন তোর বাবার সঙ্গে তোর ইস্কুলে যাওয়া নিয়ে কথা বলতে। ভালই হল।"

"গতকালও মাস্টার মশাই এসেছিলেন। তখন তুই মীনাদের বাড়ি গিয়েছিলি।" মা বলে যান, "উনি বললেন, তুইও গোপীর মত লেখাপড়া শিখতে পারবি। আমার ইচ্ছে গোপী লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক। পরীক্ষায় পাশ করে খুব বড় একটা জায়গায় চাকরি বাকরি

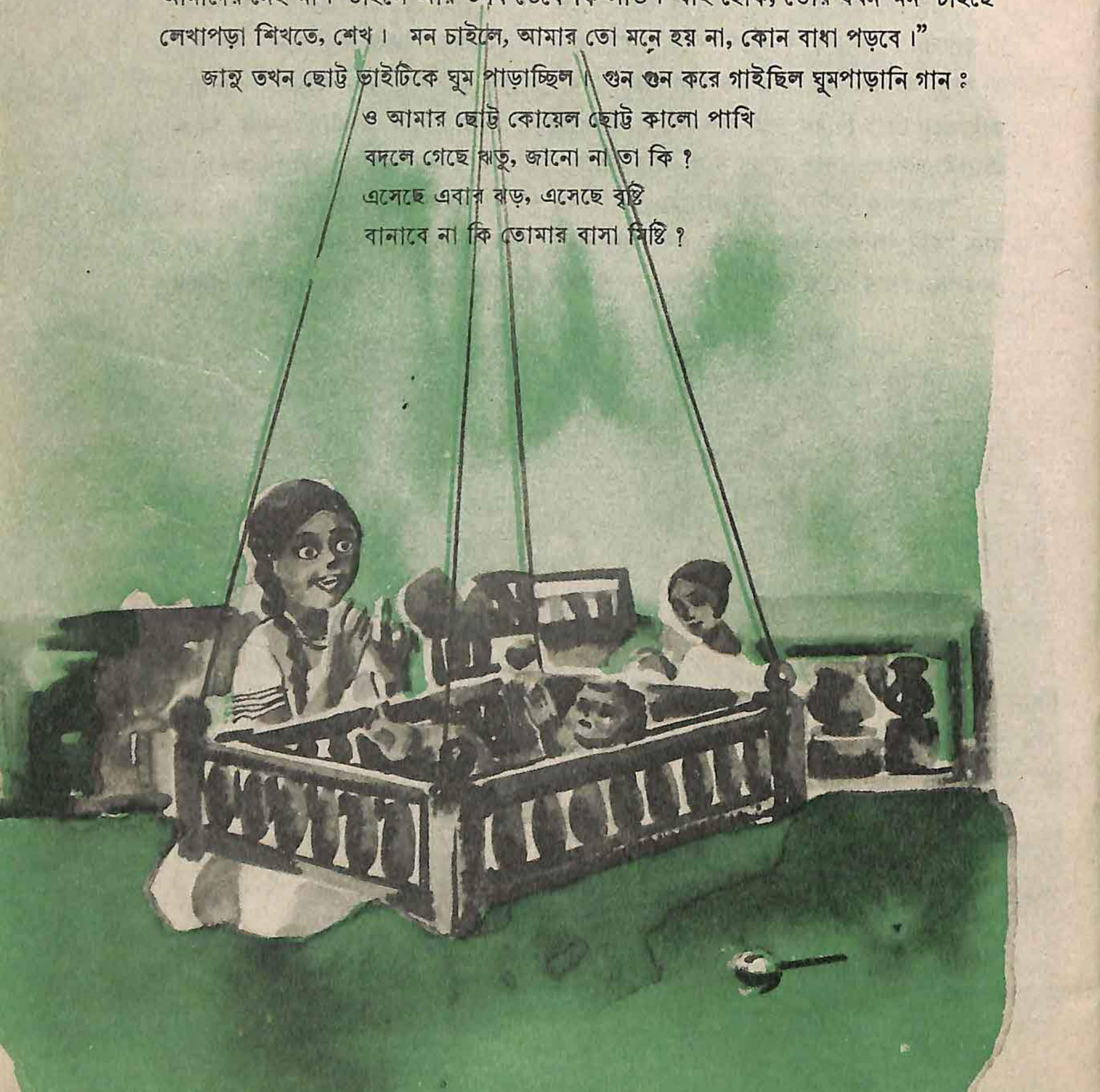


করুক। যেমন করে মীনার কাকা—অনেক দূরে। জায়গাটার নাম নাকি দিল্লি। ট্রেনে করে যেতে পাক্কা তিনদিন লাগে।”

মা বলতে থাকেন, “আচ্ছা জান্নু, ইস্কুলে গিয়ে তুই কি করবি বল তো? তুই তো তোর নামটা লিখতে শিখবি। আর কি? সেলাই মেশিনে হয়ত সেলাই করতে শিখবি। যেমন নাকি সেলাই মেশিন আছে মীনার মার। কিন্তু, সেলাই মেশিন কেনার অত টাকা তো আমাদের নেই মা। তাহলে আর ওসব ভেবে কি লাভ। যাই হোক, তোর যখন মন চাইছে লেখাপড়া শিখতে, শেখ। মন চাইলে, আমার তো মনে হয় না, কোন বাধা পড়বে।”

জান্নু তখন ছোট্ট ভাইটিকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। গুন গুন করে গাইছিল ঘুমপাড়ানি গান:

ও আমার ছোট্ট কোয়েল ছোট্ট কালো পাখি
বদলে গেছে ঋতু, জানো না তা কি?
এসেছে এবার ঝড়, এসেছে বৃষ্টি
বানাবে না কি তোমার বাসা মিষ্টি?



মার কথা শেষ হতেই জান্নু আহ্লাদে আটখানা। "মা" আদুরে গলায় চিৎকার করে উঠল। ছুটে গিয়ে মার গলা জড়িয়ে ধরল। মার গালে গাল ঠেকিয়ে জান্নু বলল, "আমি যখন বড় হব মা, আমি ইস্কুলের দিদিমণি হব। আমাদের গাঁয়ের সব বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে আমি বলব, মেয়েদের আমার ইস্কুলে পাঠিয়ে দিতে। ওদের আমি লেখাপড়া শেখাব। আমি যা যা শিখব, সব ওদের শেখাব। তুমি দেখে নিও। সত্যি, সত্যি, সত্যি বলছি।"

পরদিন সকাল। খুশিতে ডগমগ হয়ে জান্নু লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে দৌড়ে চলেছে সেই ধানক্ষেতের রাস্তা ধরে। ইস্কুলে যাওয়ার আগে একবার নদীর সঙ্গে দেখা করা চাই। এসে বসল সেই পাথরটার উপর। মাথায় বেঁধেছে লাল রিবন। চুলে গুঁজেছে হলুদ ফুল।



"আমি ঠিক করতে পেরেছি। শুনছ?" জানু নদীকে উদ্দেশ করে বলে। "সবাই আমাকে বারণ করেছিল, আমি শুনিনি। আমি ইস্কুলে গিয়েছিলাম। এখন আমাকে ওঁরা ইস্কুলে যেতে দিচ্ছেন। বুঝলে? আমি এখন লেখাপড়া শিখব। আমার নাম লিখতে শিখব। অঙ্ক কষতে শিখব। এখন আমি জানতে পারব পুকুরের কুচো মাছগুলো কী করে একদিন ব্যাঙ হয়ে যায়। আমি বাতিঘর দেখব। একদিন জাহাজও দেখতে পাবো। শুনলে?" জানু মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে থাকে।

নদীর কোন ভাবান্তর নেই। সেই একইরকমভাবে গাছগাছালির পাশ দিয়ে, ক্ষেতের কিনার ঘেঁষে, নারকেল গাছের ছায়া নিয়ে নানা উপল খণ্ডের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে।

জানু বিনুনী থেকে একটা ফুল খুলে নিয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিল। তারপর নদীকে বলল, "প্রিয় নদী, আমার এই ফুলটাকে তুমি সাগরে নিয়ে যাও। জলদি যাও। জলদি। জলদি। নইলে তুমি সেখানে ঠিকমত পৌছতে পারবে না"





সে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল। যতক্ষণ দেখা যায়। সেই সুন্দর ফুলটা নদীর স্রোতে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে সাগরের বুকে। ও জানে, সেদিন নদী যে কথা বলেছিল, তা স্বপ্ন। ও স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু, কী মজা দ্যাখো, আজ সে সত্যি সত্যি ইস্কুলে যাচ্ছে মাথায় লাল রিবন বেঁধে। এতো খুবই সত্যি!

সেই ধানক্ষেতের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে জানু এখন ছুটে যাচ্ছে ঘরের দিকে। যেতে যেতে ও যেন শুনতে পাচ্ছে সেই নদী সেইরকম ঘুম ঘুম স্বরে বলছেঃ আমার ছোট্ট সোনা বন্ধু, আবার এসো। আমি তোমাকে বলব জাহাজের গল্প। কেমন করে তারা সাগরে ভেসে ভেসে চলে। জানুর মনে হল নদীই বলছে, কিন্তু আসলে তা ধানক্ষেতের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সকালবেলার বাতাসের গুঞ্জরণ।



